ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 09. Number 01. July 2013

আহমদ ছফা : জীবনের স্ফুরণ ও স্ফূর্তি

পুরনজিত মহালদার*

সারসংক্ষেপ : ষাটের দশকের নবীন লেখক আহমদ ছফা সমকালের সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বাঙালির প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, হতাশা, নৈরাশ্য, যন্ত্রণার রক্তক্ষরণ, শূন্যতাবোধ এবং আশাবাদের কথা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। বাংলাদেশের অস্থির ও দিগভ্রান্ত সময়ে যখন রাজনীতিকদের মধ্যে চরম সুবিধাবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতা জেঁকে বসেছিল, শিল্প-সাহিত্যে বন্ধ্যাদশা, সামাজিক অবক্ষয় বাড়তে বাড়তে সুস্থ জীবনযাপনের ক্ষেত্র বিনষ্ট হবার উপক্রম, রাজনৈতিক দলগুলো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও আত্মকলহে লিপ্ত তখন আহমদ ছফা তাঁর ক্ষুরধার লেখনী চালিয়ে গেছেন। তাঁর লেখকসত্তা সৃষ্ট হয়েছে দিনে দিনে; শৈশব থেকে শুরু করে। এ প্রবন্ধে ব্যক্তি আহমদ ছফা, তাঁর বেড়ে ওঠা ও সাহিত্যে তাঁর সম্পৃক্ততার বিষয়টি দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

আহমদ ছফার লেখকসত্তায় আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রতিশ্রুতি। সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ এই লেখক শিল্পীসত্তার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধগুলোর মধ্যে। আহমদ ছফার শিল্পসার্থকতা সম্পর্কে হাসান আজিজুল হকের মন্তব্য স্মর্তব্য: 'ছয়ের দশকে উপন্যাস লিখেছেন এক তরুণ আর এক প্রবীণ লেখক আহমদ ছফা এবং সত্যেন সেন। প্রথম উপন্যাস *সূর্য তুমি সাথী*তে আহমদ ছফা লিপিকুশলতার যে প্রাবল্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে পাঠকরা তাঁর যে কোনো রচনাকে বিস্ময় ও আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ করবেন সন্দেহ নেই। পুরোপুরিভাবে সমাজনিবিষ্ট লেখক হিসেবে তিনি তাঁর রচনার ভিতর দিয়েই এই দশকের বিশুদ্ধ শিল্পবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন।'[১] ষাটের দশকের শেষলগ্নে বাংলাদেশের সাহিত্যে আহমদ ছফার আবির্ভাব। ষাটের দশকের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি সমাজের যে কোন ধরনের অন্যায়-অবিচার, অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। 'তার ভেতর সবসময় দু'টি সত্তা সক্রিয় ছিল - একটি লেখক সত্তা, অপরটি মানবিক বোধের সত্তা। তিনি কখনোই লেখার জন্য লেখেননি, সাহিত্যসাধনা করেছেন জীবনের ব্রত হিসেবে। ভেতরের দ্রোহ ও যন্ত্রণাকে সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে মেলাতে চাইতেন। এ-কারণে তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখাই তীব্রভাবে রাজনৈতিক; আবার তা শিল্পগুণে উত্তীর্ণ।'[২]

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

আহমদ ছফার জন্ম ৩০ জুন, ১৯৪৩ সাল। চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন হাশিমপুর ইউনিয়নের গাছবাড়িয়া গ্রামে। বাবা হেদায়েত আলী, মা আসিয়া খাতুন। আহমদ ছফার প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ গাছবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গাছবাড়িয়া গৌরীচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন তিনি। এই বিদ্যালয়ে পাঠকালে তিনি কয়েকজন শিক্ষকের স্নেহ লাভ করেন। এই সমস্ত 'পূত চরিত্রসম্পন্ন' শিক্ষকদের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

> আমার বাংলার শিক্ষক শিবপ্রসাদ সেন, বিজ্ঞান শিক্ষক সারদা শঙ্কর তালুকদার এবং মওলানা আবদুস সবুর এই সমস্ত পূত চরিত্রসম্পন্ন শিক্ষকদের চরিত্রের মহৎ প্রভাব সামান্য হলেও আমার জীবনে ক্রিয়াশীল হতে পেরেছে বলে আমি বিশ্বাস করি। হেডমাস্টারকে তখন আমি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে করতাম।[৩]

আহমদ ছফার হেডমাস্টার ছিলেন শ্রী বিনোদবিহারী দত্ত। স্কুলের ছাত্রাবস্থায়ই সুধাংশু বিমল দত্তের মাধ্যমে কৃষক সমিতি ও তখনকার গোপন কমিউনিস্ট পার্টির কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। আর কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করার উৎসাহ জোগাতেন তাঁর পিতা। এ-সময়ই তরুণ বয়সের রোমান্টিক বিপ্লবী উন্মাদনায়, সূর্যসেন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা কয়েক বন্ধু মিলে চট্টগ্রাম দোহাজারী রেললাইন উপড়ে ফেলেন। 'ধারণা ছিলো ওদিকে রেল না গেলে আমরা চট্টগ্রাম স্বাধীন করে ফেলবো।'[৪] অতঃপর গ্রেফতার এড়াতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মগোপন করেন। কিন্তু চট্টগ্রামে এলে গ্রেফতার হয়ে জেলখানায় বন্দী হন। এ সময়ের বর্ণনায় আহমদ ছফা বলেছেন:

> আমরা থাকতাম কানুনগো পাড়ায়। ঐ এলাকার লোকগুলো অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছিলো, এবং আমরা যে থাকার জন্য বাড়ি ভাড়া করেছিলাম লোকনাথ বলের বাড়ি, বিপ্লবী। উই ওয়ান্টেড এন এ্যাডভেঞ্চার। ... তখন জেলে ছিলেন পূর্ণেন্দু দস্তিদার, আবুল মনসুর। আমাদের ওখানে চট্টগ্রামের যারা লেফটিস্ট, কমিউটনিস্ট তারা সবাই থাকতেন, আমি ছিলাম সবচেয়ে ইয়ংগেস্ট।[৫]

প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রাবস্থায়ই রামচন্দ্রকে নিয়ে পদ্য রচনার মাধ্যমে তাঁর লেখালেখির শুরু। চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬২ সালে বাংলা সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। পাঠ শেষ না করেই বিভাগ তথা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। আহমদ ছফার ভাষ্য মোতাবেক : বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। 'ভর্তি হওয়াটা উপলক্ষ, আসল লক্ষ লেখক হওয়া।'[৬] ইসলামিক একাডেমী প্রকাশিত ছোটদের কাগজ *সবুজপাতায়* আহমদ ছফার জীবনের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক শাহেদ আলী। আহমদ ছফা বলেছেন, 'এই সবুজ পাতাতেই আমার জীবনের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো। ... শাহেদ ভাই ওই লেখাটি ছেপে আমার জীবনের গতিপথ বেঁধে দিয়েছিলেন।'[৭] সোলেমান পয়গম্বরের কাহিনী নিয়ে লেখা *অপূর্ব বিচার* নামক এই গল্পটি অধ্যক্ষ মিন্নাত আলী সম্পাদিত অষ্টম শ্রেণীর একটি বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত হয়। আহমদ ছফা ব্যক্তি জীবনে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন এবং অনেকগুলো পত্রিকা পরিচালনার সাথে যুক্ত ছিলেন। ষাটের দশকে মফিজ চৌধুরীর পরিচালনায় প্রকাশিত মাসিক

পত্রিকা *স্বদেশ* এর দেখাশোনা করতেন আহমদ ছফা। সিকান্দার আবু জাফরের মৃত্যুত্তর সময়ে *সমকালে* লিখেছেন তিনি। ষাটের দশকে প্রকাশিত কামাল বিন মাহতাব সম্পাদিত ছোটগল্প পত্রিকায় তার *হাত* গল্পটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় সিকান্দার আবু জাফরের উদ্যোগে প্রকাশিত *অভিযান* প্রত্রিকায় তিনি লিখতেন। ষাটের দশকের শেষদিকে সত্যেন সেন তরুণ প্রতিভাবান লেখকদের ব্যতিক্রমী লেখা প্রকাশের জন্য *কালি-কলম* প্রকাশনীর আবদুল হালিমের সহযোগিতায় *বোধনা গ্রন্থমালা* নামে একটি প্রকাশনা শুরুর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন আহমদ ছফা। আহমদ ছফা *স্বদেশ* পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, সরদার ফজলুল করিম, আহমদ শরীফ, সৈয়দ আকরম হোসেন, মুহম্মদ নূরুল হুদা, অসীম সাহা ও মুনতাসীর মামুনের ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন। আহমদ ছফা *গণকণ্ঠ* পত্রিকার সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। *গণকণ্ঠের* প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সাংবাদিক নাজিমউদ্দিন মোস্তান ও আরও কয়েকজনের সহযোগিতায় *উওরণ* নামে একটি সাপ্তাহিক প্রত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে *উওরণ* প্রেস থেকে *সম্ভাবনা* নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা বের হয়। *উওরণ* পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন অধ্যাপক হারুন অর রশিদ, কাজী আকরম হোসেন। উপদেষ্টা হিসেবে নাম ছাপা হতো জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, ড. মফিজ চৌধুরী এবং এম আজিজুল হকের।

পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে আহমদ ছফার অতুলনীয় ভূমিকা ছিল। '১৯৭১ সালে হুমায়ুন কবির, ফরহাদ মজহার প্রমুখকে নিয়ে আহমদ ছফা "লেখক শিবির" (লেখক সংগ্রাম শিবির) গড়ে তুলেছিলেন। এই লেখক শিবিরই স্বাধীনতার কথা স্পষ্ট করে বলেছিল যখন বেশিরভাগ লেখক- বুদ্ধিজীবী স্থিতাবস্থার পক্ষে ছিলেন অথবা বিপক্ষে দাঁড়ানোর মতো সাহসী হতে পারেননি।'[৮] সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন আড্ডায় আহমদ ছফা নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। ষাটের দশকের শেষদিকে ও সত্তরের 'প্রথম দিকে কাপ্তান বাজারের হোটেল নাইল ভ্যালি, পুরনো ঢাকার খোশমহল, আমিনিয়া ও সলোজা রেস্টুরেন্ট, ফরাশগঞ্জের লালকুঠি, নারিন্দায় কবি রফিক সন্যামতের বোনের বাড়ি, বাংলাবাজারের বিউটি বোর্ডিং, কামাল বিন মাহাতাব সম্পাদিত *ছোটগল্প* পত্রিকার লিয়াকত এভিনিউস্থ অফিস, গোবিন্দের চৌরঙ্গি রেস্টুরেন্ট ও জমাতখানা গলির টোনাদার দোকান প্রতৃতিতে।'[৯] এছাড়া বিভিন্ন লেখক, শিল্পীর বাড়িতেও ছিল তাঁর নিয়মিত যাতায়াত। 'আজিমপুরে সান্‌জীদা খাতুন-ওয়াহিদুল হকের বাসায়, ইন্দিরা রোডে ড. মফিজ চৌধুরীর বাড়িতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. আহমদ শরীফের কোয়ার্টারে সাহিত্যিক আড্ডা, বৈঠকে তিনি নিয়মিত হাজিরা দিতেন।'[১০] জীবনের শেষ দিকে আজিজ সুপার মার্কেটের *উত্থানপর্ব* কার্যালয়ে ছিল তাঁর সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র। মুক্তিযুদ্ধকালে কলকাতায় অবস্থানকালেও তিনি বিভিন্ন লেখক-শিল্পীর সান্নিধ্যে আসেন। আহমদ ছফা বলেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সাত-আট মাস সময় কোলকাতায় নরেনদার সঙ্গে উদয়ন ছাত্রাবসে এক সঙ্গে কাটিয়েছি। আমরা শুধমাত্র দু'জন নয় আরো কতিপয় বাংলাদেশী যুবক মিলে একটি পরিবারের মতো মিলেমিশে ছিলাম। প্রয়াত গল্পকার বিপ্লব দাস এবং নাট্যশিল্পী মামুনুর রশিদও আমাদের সঙ্গে ছিলেন।'[১১] মুক্তিযুদ্ধের সময় এপ্রিল মাসের দিকে তিনি আগরতলা যান। কলকাতায় গিয়ে তিনি কমরেড মোজাফফর আহমদের সান্নিধ্য লাভ করেন। এ সময় তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের গতিবেগ ত্বরান্বিত করার

মানসে *জাগ্রত বাংলাদেশ* রচনা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে *দাবানল* পত্রিকা সম্পাদনা করা ছিলো তাঁর ঐ সময়ের উল্লেখযোগ্য কাজ।

কলকাতায় অবস্থানকালে অধ্যাপক বিজন চৌধুরী, বিকচ চৌধুরী, কংগ্রেসের সাপ্তাহিক মুখপত্র *রুদ্রবীণার* সম্পাদক খগেন চক্রবর্তী, ত্রিপুরার দৈনিক *সংবাদের* সম্পাদক ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত রায়চৌধুরী, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কমলকুমার সিংহ, পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক মিহির ভট্টাচার্য, প্রাবন্ধিক-সমালোচক অধ্যাপক কার্তিক লাহিড়ী, কবি ও ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার, জয় গোস্বামী, *আনন্দবাজার* পত্রিকার নিউজ এডিটর অমিতাভ চৌধুরী, নকশাল নেতা অর্চনা চৌধুরী প্রমুখের সাহচার্য লাভ করেন।[১২] স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এসেও তিনি এই সকল ব্যক্তির সাথে যোগাযোগও রক্ষা করেন। ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারির দিনপঞ্জিতে আহমদ ছফা লিখেছেন, 'সুনন্দা, মুজফফ্‌র কাকু এবং ইসলাম সাহেবকে চিঠি লিখলাম। ... অর্চনা স্মৃতিতে জ্বালাতন করছেন।'[১৩]

আহমদ ছফা দীর্ঘ তিন-চার দশক ধরে প্রজন্মান্তরে তরুণদের প্রতিভাকে লালন করে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি আশাবাদী, নব প্রজন্মের কিছু প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে মানব কল্যাণের অভিমুখে নিয়ে যেতে প্রত্যয়ী উদ্যোগে অগ্রসর হচ্ছে। সুযোগ আছে, সময় পেলে তাদেরকে এগিয়ে নেব।'[১৪] আহমদ ছফার উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, আবুল হাসান, হুমায়ূন আহমেদ, সোহরাব হাসান, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, রতন বাঙালিসহ অনেক লেখকেরই প্রথম বই প্রকাশিত হয়। এছাড়া তরুণ প্রজন্মের বিভিন্ন লেখককে তিনি আর্থিকভাবেও সহায়তা করেছেন। একজন আশাহত মানুষ আহমদ ছফার কাছ পর্যন্ত গেলে তিনি আর আশাহত থাকতেন না। যতো দূর এবং যতো দ্বার পর্যন্ত গেলে একজন মানুষের সংকটের সমাধান হয় সে পর্যন্ত তিনি যেতেন। দীপংকর গৌতম স্মৃতিচারণে বলেছেন, '১৯৯৫ সালের কথা। গোপীবাগ কে এম দাস লেনে আমার রুমে চুরি হয়ে গেল। পকেটে টাকা নেই। ... তারপর একদিন সকালে গেটে দেখি ছফা ভাই একটা ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে একটা পাঞ্জাবি, দুটো প্যান্ট, জামা আর পকেটে ৫০০ টাকার একটি নোট গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন। এ টাকা ছফা ভাই কোনদিন ফেরত নেননি। কতোদিন গেছে *উত্থানপর্বে* যাবামাত্রই হাতে ৫০টি টাকা দিয়ে বলেছেন, ভাত খেয়ে নিও।'[১৫] সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে হুমায়ূন আহমেদ এবং জাফর ইকবালের পরিবারকে বাংলাদেশ সরকার একটি বাড়ি বরাদ্দ করে। কিন্তু এক মধ্যরাতে রক্ষীবাহিনী এই শহীদ পরিবারকে রাস্তায় নামিয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে আহমদ ছফা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহুতি দেওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি সেদিন হুমায়ূন আহমেদকে বলেন :

> হুমায়ূন আমার সঙ্গে রিক্সায় উঠুন, আমরা গণভবনে যাব একটা রিনাউন শহীদ পরিবারকে বাড়ি হতে উচ্ছেদ করে জ্ঞানীর কলমের চেয়ে পবিত্র রক্তকে অবমাননা করা হয়েছে। অপমান করা হয়েছে স্বাধীনতা ও জাতির আত্মদানের গৌরবমণ্ডিত ঐশ্বর্যকে।[১৬]

হুমায়ূন আহমেদ স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'ছফা ভাই গায়ে কেরোসিন ঢেলে জীবন বিসর্জন দিতে যাচ্ছেন, এই খবর চারদিকে অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। কবি সিকান্দার আবু জাফর ব্যস্ত

হয়ে ছফা ভাইয়ের কাছে এলেন। ধমক দিয়ে বললেন, আমি ব্যবস্থা করছি।'[১৭] আহমদ ছফা কোন প্রকার অন্যায়- অবিচারের সাথে কোনদিন আপোষ করেননি। তিনি বলেছেন :

> সম্ভবত আমি লেখকদের মধ্যে প্রতিনিয়ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করে চলেছি। আপোষ আমি করতে জানি না। আমার জন্মই হয়েছে ভয়ংকরভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা।[১৮]

ব্যক্তিজীবনে আহমদ ছফা সত্তরদশকে 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে'র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। আশির দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এই দলের সাথে তাঁর যোগাযোগ বজায় ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে রাজনীতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি লেখালেখির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শিল্পী এস.এম সুলতানকে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে আহমদ ছফার অগ্রণী ভূমিকা ছিলো। ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক হোস্টেলে বাসকালে তিনি বস্তির ছিন্নমূল শিশুদের জন্য 'শিল্পী সুলতান শিক্ষাকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে তিনি মুক্ত জ্ঞানচর্চার সুযোগ পান। এ সমস্ত শিক্ষকের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফ, ড. হুমায়ূন আজাদ, ড. অজয় রায়, আবুল কাসেম ফজলুল হক উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

> প্রফেসর আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের একটি। দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা নির্মাণে, নিষ্কাম জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে, প্রচলিত জনমত উপেক্ষা করে নিজের বিশ্বাসের প্রতি স্থিত থাকার ব্যাপারে প্রফেসর আবদুর রাজ্জাকের মতো আমাকে অন্য কোনো জীবিত বা মৃত মানুষ অতোটা প্রভাবিত করতে পারেনি।[১৯]

'১৮০০ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাঙলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব, বিকাশ এবং বাঙলার সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে তার প্রভাব' শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণার তত্তাবধায়ক হিসেবে তিনি অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাককে পান। পরবর্তীতে তিনি অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সম্পর্কিত *যদ্যপি আমার গুরু* (১৯৮৮) গ্রন্থটি রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে আহমদ ছফার দান অসামান্য। দেশ, দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল গভীর, আত্যন্তিক। চিন্তা-চেতনার স্বচ্ছতা এবং আপোষহীন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যজগতে স্বতন্ত্র। উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, সমালোচনা গ্রন্থ, আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, রাজনীতি, দর্শন, সংস্কৃতি, সংগীত, ললিতকলা, ধর্মীয় দর্শন, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মত দূরদর্শী বিশালতা বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছে। ১৯৭৫ সালে লেখক শিবির পুরস্কার (প্রত্যাখ্যাত) ও ১৯৭৯ সালে ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার লাভ করেন তিনি। ২০০১ সালের ২৮ জুলাই অসুস্থাবস্থায় ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু ঘটে আহমদ ছফার। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে জানাজা শেষে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে দাফন করা হয় তাঁকে। ২০০২ সালে সাহিত্যের জন্য মরনোত্তর একুশে পদক প্রদান করা হয় আহমদ ছফাকে।

ষাটের দশকে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ধারায় স্বকীয় সাধনা ও প্রতিভার শক্তিময় প্রাতিস্বিকতায় আহমদ ছফা নিজস্ব স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন। সময় ও সমাজ বাস্তবতার সাথে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধের সমন্বয়ে তিনি রচনা করেছেন একটি সৃষ্টিশীল জগত। দীর্ঘ চার দশক ধরে শক্তিশালী এই কথাসাহিত্যিক বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে যে নতুনমাত্রা যোগ করেছেন তা বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই বোধকরি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ হাসান আজিজুল হক, *কথাসাহিত্যের কথকতা*, ১ম সংস্করণ (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ. ২৫।
২ সোহরাব হাসান, "আমাদের ছফা ভাই", মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান (সম্পা.) *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ*, ১ম সংস্করণ (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃ. ১৩৩।
৩ আহমদ ছফা, "রোগ শয্যায় বিরচিত", *উপলক্ষের লেখা*, ১ম সংস্করণ (ঢাকা: শ্রী প্রকাশ, ২০০১), পৃ. ১১৫।
৪ নাসির আলী মামুন, *আহমদ ছফার সময়*, ২য় সংস্করণ (ঢাকা: শ্রাবণ, ২০০৫), পৃ. ৪৩।
৫ *তদেব*, পৃ. ৪৪।
৬ আহমদ ছফা, "অনিঃশেষ ঋণ", *উপলক্ষের লেখা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩।
৭ আহমদ ছফা, *উপলক্ষের লেখা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩।
৮ সোহরাব হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৪।
৯ শাকিনা হাসীন (গ্রন্থনা),"আহমদ ছফা: জীবনপঞ্জি", *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭১।
১০ আহমদ ছফা, *উপলক্ষের লেখা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩।
১১ *তদেব*, পৃ. ৭০।
১২ শিবনারায়ণ দাশ, "আমার অনুভূতিতে ছফার প্রতিবিম্ব", মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান (সম্পা.), *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৯।
১৩ নূরুল আনোয়ার (সম্পা.) *আহমদ ছফার ডায়েরি*, ১ম সংস্করণ (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৪), পৃ. ৮।
১৪ মোহাম্মদ আমিন, *আহমদ ছফার চোখে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী*, ১ম সংস্করণ (ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ২৭।
১৫ দীপংকর গৌতম, "আহমদ ছফার মৃত্যুকে আমি স্বীকার করিনা", মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান (সম্পা.), *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৫।
১৬ মোহাম্মদ আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩।
১৭ হুমায়ূন আহমেদ, "পড়বে না তাঁর পায়ের চিহ্ন", মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান (সম্পা.), *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১।
১৮ নাসির আলী মামুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩।
১৯ আহমদ ছফা, "যদ্যপি আমার গুরু", *আহমদ ছফা রচনাবলী*-৩, ১ম সংস্করণ (ঢাকা: সন্দেশ, ২০০২), পৃ. ১৮৪।